অমলচরিতা জনকদুহিতা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়েছে। মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে। ভোরবেলায় রাজগুরু বশিষ্ঠদেব পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে শিষ্যসঙ্গে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তিনি রাজার মিত্র সূতপুত্র সুমন্ত্রকে অনুরোধ করলেন, ''রাজাকে খবর দিন। সমস্ত রাজ্য সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়েছে, আনন্দিত জনগণ উন্মুখ হয়ে আছে রামচন্দ্রের অভিষেক দেখবে বলে। মহারাজ যেন তাড়াতাড়ি পূজাস্থানে আসেন। পুষ্যানক্ষত্রের পুণ্যলগ্নে রামের অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে।'' গুরুদেবের আদেশে রাজ অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন সুমন্ত্র।

এদিকে সেসময় অন্তঃপুরে কৈকেয়ীর রাজনীতির কূটজালে মহারাজ শোকে প্রায় মূর্ছিত। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মহলে প্রবেশ করে গুরু বশিষ্ঠের নির্দেশ জানালে শোকাহত দশরথ কোনওমতে সুমন্ত্রকে তাঁর কাছে রামচন্দ্রকে নিয়ে আসার কথা জানাতে পারলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর অনায়াস মিথ্যাভাষণে সুমন্ত্র রাজা দশরথকে সে-অবস্থায় দেখেও বিপর্যয়ের কোনও পূর্বাভাসই পেলেন না।

সুমন্ত্র এবারে চললেন রামভবনে। শারদীয়া মেঘের মতো স্নিগ্ধ, শুভ্র সেই প্রাসাদ যেন ইন্দ্রের ভবন। সোনার মূর্তি আর মণিমাণিক্যে শোভিত উদ্যান পার হয়ে সুমন্ত্র প্রবেশ করেন প্রাসাদের মধ্যে। সোনার খাটে এক সুন্দর চাদর পাতা আছে; আর তার ওপর বসে আছেন অলংকার আর পবিত্র সুগন্ধি চন্দনের অনুলেপনে সজ্জিত শত্রুতাপন মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর পাশে বসে একটি ছোট পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন সীতা। মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রথম বৈদেহীর একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি উন্মোচিত করলেন আমাদের সামনে। শত শত দাসদাসী যাঁর আজ্ঞাধীন সেই রাজনন্দিনী, রাজবধূ সীতা স্বয়ং স্বামীর পরিচর্যা করে চলেছেন, এই সানন্দ শ্রমস্বীকারে যেন তাঁর পরম পরিতৃপ্তি! যুগলমূর্তির বর্ণনা দিয়ে বাল্মীকি বলছেন, ''উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা''[১]—যেন চিত্রা নক্ষত্রের পাশে চাঁদ। রামচন্দ্রকে অভিবাদন জানিয়ে সুমন্ত্র করজোড়ে জানালেন যে পিতা দশরথ রামকে দেখতে চান, শ্রীরাম যেন কৈকেয়ীভবনে খুব তাড়াতাড়ি চলে যান।

পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য করে রামচন্দ্র চললেন

অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

পিতার কাছে; সীতাকে পরম প্রীতির সঙ্গে বললেন, ''সীতা, পিতা ডেকেছেন, আমায় দ্রুত যেতে হবে। তুমি সঙ্গিনীদের সঙ্গে আনন্দে থাকো এখানে।'' অসিতেক্ষণা জানকী মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করতে করতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তাঁর শুদ্ধমনে রামচন্দ্রের আশু বিপদের কোনও ছায়া পড়েছিল কি? রাজ্যাভিষেকের জন্য শুভকামনা করে সীতা প্রার্থনা করতে লাগলেন, ''তোমার যাত্রাপথে বজ্রধর ইন্দ্র পূর্বদিক, যম দক্ষিণদিক, বরুণ পশ্চিমদিক এবং ধনপতি কুবের উত্তরদিক রক্ষা করুন।'' সীতা অনন্ত প্রার্থনারই এক সাকার প্রতিমা যেন। আমরা দেখতে পাই, সমগ্র মহাকাব্যে মহিমময়ী মৈথিলীর প্রতিটি চলন-বচন এক স্নিগ্ধ মাধুর্য আর মঙ্গল বর্ষণ করে চলেছে। সেই পবিত্রতার শক্তিকে স্মরণ করেই দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, ''এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ—তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক।''[২] মঙ্গলময়ী সীতার রামের সঙ্গে বনে যাত্রা ও অরণ্যে দিনযাপনের অংশটিতে আবার আমরা দৃষ্টিপাত করব যেখানে জনকনন্দিনীর চরিত্র বহু বিভঙ্গে আলোকিত হয়ে আছে।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য সহধর্মচারিণী সীতাও উপবাসে আছেন। দেবতার উদ্দেশে যা কিছু ক্রিয়াকর্ম সব সম্পন্ন করে পতির প্রতীক্ষায় ছিলেন জনকনন্দিনী। এখানে বাল্মীকি তাঁর সম্বন্ধে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, ''অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি''[৩]—রাজপুত্রী বৈদেহী কিন্তু রাজঘরানার কন্যা, তাই তিনি রাজধর্ম সুনিপুণভাবে জানেন। সেজন্য বিষণ্ণ পতিকে ফিরতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। যৌবরাজ্যে যিনি অভিষিক্ত হতে চলেছেন তাঁর মাথার ওপর শ্বেতশুভ্র ছত্র নেই, পাশে কেউ ব্যজন করছে না, সূত বা মাগধ গায়কদের স্তুতিবন্দনা শোনা যাচ্ছে না, রামচন্দ্রের সামনে সুসজ্জিত অশ্ববাহিত রথ নেই, সুন্দর শুভলক্ষণ গজরাজ নেই—সীতা বুঝতে পারলেন, কোনও মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁর স্বামী। অবশেষে জানতে পারলেন রামচন্দ্রের বিষণ্ণতার কারণ—তাঁর চোদ্দো বছর বনবাসের আদেশ হয়েছে, রামচন্দ্র আর রাজ্যের উত্তরাধিকারী নন।

রাঘব নানাভাবে সীতাকে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে আগামী চোদ্দো বছর অযোধ্যায় কীভাবে কাটাতে হবে তার ছোটখাট নির্দেশ দিচ্ছিলেন, কিন্তু বিদেহনন্দিনী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের! মুহূর্তের মধ্যে এক অতি দুঃসহ কৃচ্ছ্রতাসাধনের সংকল্প নিয়ে নিলেন তিনি যা আর পাঁচজন সুখলালিতা রাজকন্যা কল্পনাতে আনতেও ভয় পাবেন।

সীতা রামের সঙ্গে বনে যেতে চাইলে রামচন্দ্র তো নিষেধ করবেন স্বাভাবিকভাবেই, তিনি অবশ্যই ভাববেন যে রাজপুত্রীর যেহেতু অরণ্যের অভিজ্ঞতা নেই, সেজন্য সে স্বামীর সঙ্গে আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় এরকম অবাস্তব আবদার করে চলেছে। কিন্তু কিশোরী সীতার মধ্যে কত যে বিচক্ষণতা, তা রঘুপতি প্রথমে বুঝতে পারেননি। পতিকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেদনার ঠিকই, কিন্তু কেবল সেজন্যই নয়, সীতা অনুভব করছেন যে পতির এই দুর্গম বনবাস অনেক সহনীয় হবে যদি তিনি সঙ্গে থাকেন, নইলে এত আঘাত সহ্য করা রঘুনাথের পক্ষে বড় বেশি মর্মান্তিক হয়ে যাবে। রামকে প্রবোধ দিয়ে সীতা বলেন,

''প্রাণনাথ, কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব, সঙ্গে লহ দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥''[৪]

আমাদের মনে পড়ে যায় আর একটি চিত্র। ১২৭৮ বঙ্গাব্দ। জয়রামবাটীর এক কিশোরী, রামায়ণ মহাকাব্যের নায়িকার মতনই বয়স তাঁর, স্বামী

দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ির পুরোহিত, লোকমুখে শোনেন যে স্বামী তাঁর উন্মাদ হয়ে গেছেন। গ্রাম্য পরিবেশে কত মানুষের কত রটনা, কত গঞ্জনা—বালিকার মন ভার হয়, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তার বদলে তাঁর মনে হয়, এই অসময়ে স্বামীর পাশে থাকা প্রয়োজন। চৈত্রমাসের এক প্রভাতে পিতার সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন সারদা, তাঁর পতিদেবতা যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে। মুক্ত পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা পল্লীবালা সেদিন স্বামিসেবার জন্য নহবতের ছোট্ট কুঠুরিতে যে-বদ্ধজীবন সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তা কিছু কম কষ্টসাধ্য ছিল না। যুগে যুগে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়, শুধু রঙ্গমঞ্চটি পালটে পালটে যায়।

রামের বনবাসের কথা শুনে কৌশল্যা শোকে মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন, কত অভিযোগপূর্ণ বিলাপবাক্য শোনা গেছে তাঁর মুখে, কিন্তু অশ্রুমুখী সীতার কণ্ঠে গুরুজনদের প্রতি একটিও অভিযোগ শোনা গেল না। এত কমবয়সে বিনা দোষে তাঁর ওপর এত বড় অভিশাপ নেমে এসেছে, সে-বিষয়ে কোনও অনুযোগ করলেন না তিনি। তিনি বোধহয় তখনই জেনে গিয়েছিলেন, বিপদকালে কেবল অন্যকে দোষারোপ করলে সমস্যার জটিলতা বাড়ে বই কমে না। বরং সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই রামের সঙ্গে বনে যাওয়ার অভিপ্রায় জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন রামের মনোভার লাঘব করার জন্যই বনের এক সুরম্য ছবি তুলে ধরেন রামের সামনে।

''অগ্রতস্তে গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
ইচ্ছামি সরিতং শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ॥
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ॥''[৫]

''যেসব দিঘিতে হাঁসেরা খেলা করে, সুন্দর পদ্মফুল ফোটে, সেখানে আমি নিত্য স্নান করব। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার ভয় কী?'' অবসাদগ্রস্ত মানুষকে আবার প্রফুল্ল করার জন্য আধুনিক মনোরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই পদ্ধতির আশ্রয় নেন। তাঁরা খুব মন্দ একটি ঘটনার সামান্য ভাল অংশকেও এমনভাবে রোগীর সামনে চিত্রিত করেন যে বিষণ্ণ মানুষটির মনে আবার সাহস ফিরে আসে। সীতা যেন সেই পদ্ধতিতেই স্বামীর মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করছেন :

''বল সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়।...
বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্বতে করিব আরোহণ।''[৬]

কতভাবে যে স্বামীকে আশ্বস্ত করে চলেছেন তিনি! তিনি জানেন যে রঘুকুলতিলকের এই দণ্ডের আর একটি অঙ্গ আছে। ব্রহ্মচর্যমণ্ডিত বনবাসের নির্বাসনদণ্ড হয়েছে তাঁর। সে-বিষয়েও তাঁকে ভরসা দিয়ে বলছেন, ''শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।/ সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধু-গন্ধিষু॥'' আমি ব্রহ্মচারিণী হয়ে তোমার নিত্য সেবা করব আর মধুগন্ধী বনে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। সীতা বনের বিভীষিকার কথা জানতেন না তা তো নয়, কিন্তু কথার তুলিতে আগামী বনযাত্রার এমন এক বর্ণনা তিনি এঁকে চলেছেন, যেন তিনি কোনও প্রমোদ উদ্যানে যেতে চাইছেন। এ যে বালিকা-সুলভ চপলতা নয় তা বোঝা যায় তাঁর ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের সংকল্প দেখে। তিনি যখন বলেন,

''বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পৌরুষৈঃ অকৃতাত্মভিঃ॥''[৭]

''বনবাসে অনেক দুঃখ আছে জানি, কিন্তু তাতে দুঃখ পায় কেবল তারাই যারা অজিতেন্দ্রিয়।'' অর্থাৎ মহীয়সী সীতা, সতেরো-আঠারো বছরের কিশোরী সীতা পরম আত্মবিশ্বাসে স্বামীকে জানাতে দ্বিধা

করেন না যে তিনি জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি যেমন ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণে স্বামীর সহধর্মিণী ঠিক তেমনই শারীরিক ক্লেশ সহন করার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্টই আছে। এখানেও মনে পড়ে যায় হাজার হাজার বছর পার করে অবতীর্ণা যুগাবতার-সঙ্গিনীর কথা, স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে যে-অষ্টাদশী নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন, ''তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'' ব্রতধারী স্বামীকে কোনও অসুবিধায় ফেলতে তিনি আসেননি।

রাজপুত্রীর জিতেন্দ্রিয়তা এবং ত্যাগের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল যখন রাম তাঁকে বনবাসের নিয়ম অনুযায়ী দান করতে বললেন। স্বামীর সঙ্গছাড়া হবেন না তিনি—এই আনন্দে বিভোর নির্লোভ, অনাসক্ত মিথিলারাজনন্দিনী তাঁর বহুমূল্য অলংকার, বস্ত্র—সব বিলিয়ে দিতে চললেন। তিনি তো সাজতে ভালবাসতেন—নিশ্চয়ই অলংকারগুলি তাঁর শখের ছিল, কিছু বা ছিল তাঁর পিতার দেওয়া। অলংকার তো শুধু শোভা নয়, কত স্মৃতির উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলে, কিন্তু সীতা অক্লেশে সব দিয়ে দিলেন।

তবে রাজকুমারের অনুমতি সীতা যে কেবল অশ্রুসজল বাক্য আর কিছু শাস্ত্র অনুসারী যুক্তি দেখিয়েই পেয়ে গিয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। সীতাকে কোমলস্বভাব বলে মনে হলেও তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী। সকলের সুখের জন্য, এবং রামের প্রতি অনন্য প্রেমে তিনি নিজের অস্তিত্বকে একটা মৃদুতার আবরণে ঢেকে রাখতেন যেন, কিন্তু প্রয়োজনে তাঁর চরিত্রকে আমরা ঝলসে উঠতে দেখি। অরণ্যেও পতির সঙ্গে আনন্দে কাটানো যাবে, সেকথা সীতা যতই বোঝাতে যান রামচন্দ্রকে, রঘুপতি ততই অরণ্যের বিভীষিকার কথা বলে সীতাকে নিরস্ত করতে থাকেন। সীতা অবলা, সীতার সুখে অভ্যস্ত দেহ, বনে হিংস্রজন্তু আর রাক্ষসের ভয় আছে—বারে বারে এই একই কথা শুনতে শুনতে সর্বংসহা জনকনন্দিনীরও যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ''আপনি দেখছি আসলে একজন স্ত্রীলোক। বাবা আপনাকে ভুল করে অন্যান্য পুরুষদের থেকে আলাদা ভেবেছিলেন। নিজের স্ত্রীকে কাছ রাখতে চাইছেন না, কাকে ভয় করছেন আপনি?'' রামপ্রিয়া কি তাঁর প্রাণের দেবতাকে অপমান করছেন? যদিও বাল্মীকি বলছেন যে সীতা প্রেমে ও অভিমানে স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্যের প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু আমাদের তো মনে হয় কখনই সেটা হতে পারে না। রামময়জীবিতা সীতা আত্মপ্রীতির জন্য কোনওভাবেই স্বামীকে আহত করবেন না। কষাঘাতের মতন তাঁর এই তীক্ষ্ণ ধিক্কার হয়তো রামচন্দ্রের কোনও অহেতুক ভয় এবং শোকের জড়তা কাটিয়ে দিয়েছিল। অবতারসঙ্গিনী তো অবতারের শক্তি! কখনও নিদ্রাচ্ছন্ন নারায়ণকে জাগিয়ে তোলার জন্য মহাশক্তির প্রয়োজন হয়।

সীতা অলংকার এবং বহুমূল্য বস্ত্র ত্যাগ করে অতি সাধারণ বেশে দশরথের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে। কৈকেয়ী তাঁর হাতে বল্কল তুলে দিলে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেও চীর ধারণ করেই বনে যাওয়া স্থির করেন তিনি। কিন্তু এই দৃশ্যে সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হন। অবশেষে দশরথের আদেশে আবার অলঙ্কারমণ্ডিতা হলেন সীতা। ''সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।/ ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ॥''[৮] —সুজাতা সীতা বিচিত্র আভরণে-ভূষণে সেজে বনে যাত্রা করলেন। তিনি সদা সুসজ্জিতা থাকতেন বনবাসেও। নহবতের ছোট ঘরে ত্যাগ ও সেবার পরাকাষ্ঠা মা লক্ষ্মীর সাম্প্রতিক মানবীরূপটিও যেমন সালংকারা ছিল। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের তাপসী প্রতিমা সারদা কখনই কিন্তু অলংকার ছাড়া থাকেননি। এমনকী স্বামীর অবর্তমানে সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও তিনি কিছু অলংকার ধারণ করেছিলেন। মা লক্ষ্মী তো কখনও নিরাভরণা হন

না, তাহলে যে জগৎ শ্রীহীন হয়ে যাবে! তাই সীতা বা সারদা সর্বদাই আভরণভূষিতা থাকতেন।

এ-ঘটনায় সীতা-মহিমার আর একটি দিক উন্মোচিত হয়। সেযুগে পুরুষরা, বিশেষত রাজবংশীয়েরা কতরকমের অলংকার ধারণ করতেন। সেখানে পুত্রের নিরাভরণ বনবাসী রূপ দশরথ সহ্য করে নিলেন, কিন্তু সীতার এমন বৈরাগ্যের বেশ সহ্য করতে পারলেন না। বনে যাচ্ছেন সীতা, বনবাসিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করবেন—সেটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু মৈথিলীর বিন্দুমাত্র অমর্যাদা সহ্য করতে পারেন না দশরথ। সীতা যে তাঁর শ্বশুরালয়ে সকলের কত প্রিয় ছিলেন তা এই ঘটনায় ভালভাবে বুঝতে পারি আমরা। মানুষ কেবলমাত্র নিজের গুণেই নতুন পরিবেশে সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে। জনকনন্দিনীও তাঁর অপরূপ মাধুর্যে, ত্যাগ ও সেবায় শ্বশুরকুলে সকলের নয়নের মণি হয়েছিলেন।

এই স্নেহ এতটাই গভীর ছিল যে দশরথের দেহান্তের একবছর পর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বনে থাকলেও রামচন্দ্র গয়াধামে তাঁর সাধ্যমতো পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করবেন বলে ঠিক করেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে দুই ভাই স্থানান্তরে গেলেন আর সীতা অপেক্ষা করতে লাগলেন ফল্গু নদীর তীরে। নদীতীরে বসে আপন মনে বালি নিয়ে খেলছেন সীতা, হঠাৎ সেখানে দশরথ এসে উপস্থিত।

''দশরথ কহিলেন, শুন ওমা সীতে
ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে॥
তুমি বধূ, আমি তব শ্বশুরঠাকুর।
অরপিয়া বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর॥''[৯]

সীতা তো অবাক। স্বামী বর্তমানে তিনি শ্বশুরকে কী করে পিণ্ড দেবেন? আবার তাঁর অতি শ্রদ্ধাভাজন এই বলিষ্ঠ মানুষটি পরলোক থেকে এসেছেন তাঁর সামনে—ক্ষুধার্ত বলে পারলৌকিক আহার চাইছেন—তিনি না দিয়ে থাকেনই বা কী করে? অবশেষে কিছু আবশ্যিক ব্যবস্থা করে তিনি দশরথকে বালির পিণ্ডই দিলেন, কারণ আর কোনও আহার তাঁর কাছে ছিল না। আনন্দিত দশরথ সেই পিণ্ড নিয়েই রথে উঠলেন—রথ চলে গেল স্বর্গপথে। পিণ্ড দানের অধিকার প্রধানত পুরুষের। পুত্র বর্তমান থাকলে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানের অধিকার থাকে একমাত্র পুত্রের। দশরথের বোধহয় আবার স্নেহময়ী সীতার হাতে সেবা পাওয়ার সাধ জেগেছিল। সেজন্যে তিনি সব প্রচলিত নিয়ম ভেঙে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে উপেক্ষা করে বধূমাতার হাতে আহার চেয়ে নিয়ে গেলেন।

রাম যখন বনগমনের আগে তাঁর ধনরত্ন ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য-পরিজনদের দান করে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পিতার কাছে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে পথে বার হন, তখন রাজপথ ছিল লোকে লোকারণ্য। এতই জনসমাবেশ ছিল যে, দুঃখিত অযোধ্যাবাসীরা প্রাসাদের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছিল রামকে দেখার জন্য। পায়ে হেঁটে তিনজনকে পথে চলতে দেখে তাদের শোক আরও শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

''পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সতীতঞ্চ জনাস্তদা।
উচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ॥
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনা॥''[১০]

যে-সীতাকে আকাশচারী প্রাণীরাও দেখতে পেত না, তাকে আজ পথের লোকজন দেখছে—এ তো শুধু রাজবংশ নয়, সমগ্র অযোধ্যাবাসীর অমর্যাদা! অযোধ্যাবাসীর এই বিলাপে আমরা একটু বুঝি যে রাজপরিবারের বধূ সীতা প্রকাশ্য জনপথে আসেননি কখনও, আসার প্রয়োজনও হয়নি। সেই রঘুবীরপ্রিয়া যখন বনপথে চলেছেন, তখন কোনও আবরণ বস্ত্র নেই তাঁর সামনে, তিনি কিন্তু একইরকম স্বচ্ছন্দ পথ চলায়। বন-বনান্তর অতিক্রম করছেন তাঁর মহাবলী স্বামী এবং দেবরের সঙ্গে, যদিও

তাঁদের তুলনায় তাঁর কোমল শরীরে শারীরিক বল এবং কষ্ট স্বীকারের অভ্যাস—দুটিই অনেক কম। কিন্তু এজন্য তিনি কখনও পথ চলায় বিরত হয়ে বলেননি, ''আমি আর পারছি না, আমায় অযোধ্যা বা মিথিলায় পাঠিয়ে দাও।'' শরীরের ক্ষমতা না থাকলে আবেগ এবং অ্যাডভেঞ্চার আমরা বেশিদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারি না। অনভ্যাসে বিদেহনন্দিনীর শরীরে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকার কথা নয়, তবু যে তিনি এই শ্রম অনায়াসে, নিরুচ্চারে সহ্য করে গেছেন, সে শুধু তাঁর রামের প্রতি সুগভীর প্রেমে—পাতিব্রত্য ধর্ম বা কর্তব্য পালনের অবিচলনিষ্ঠায়। 'যখন যেমন, তখন তেমন'-এর আদর্শ মূর্তি যেন সীতা।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ কখনও কখনও চলেন জঙ্গল পেরিয়ে গ্রামের পথে। তাঁদের দেখে সরল গ্রামবাসীদের কৌতূহল ও আনন্দের সীমা থাকে না। কথা ছড়িয়ে যায় লোকমুখে—পরম সুন্দর দুই যুবাপুরুষ এবং এক দেবী এসেছেন গ্রামে। একবার এক গ্রামে তাঁদের আসতে দেখে একজন গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি সামনের বটগাছটির ছায়ায় কচি ঘাসপাতা দিয়ে শয্যা প্রস্তুত করে বলল, ''এখানে বিশ্রাম করে নিন আপনারা। আজ রাতটুকু থেকেও যেতে পারেন, কাল সকালে না হয় চলে যাবেন।'' আর একজন গ্রামবাসী কলসি করে জল এনে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ''আপনার হাত-পা ধুয়ে নিন।'' রামচন্দ্র তাঁদের আন্তরিকতায় খুব প্রসন্ন হন। তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে সেই তৃণশয্যায় বসলেন। তখন কৌতূহলী, মুগ্ধ গ্রামবাসীরা একে একে সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। গ্রামের বউ-ঝিরা ঘিরে ধরল সীতাকে। ''ও সুন্দর মেয়ে, বলো না—ওই দুজন তোমার কে হয়?''—''সুমুখি কহহু কো আহিঁ তুমহারে?''[১১] রাজকন্যা সীতা বেশ মজাই পেলেন। ''আমি এদেশের হবু রানি, দশরথের পুত্রবধূ, এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন''—বলে ধমক দিয়ে উঠলেন না তাদের। বরং ওদেরই মতো সলজ্জ ভঙ্গিমায় প্রথমে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে বললেন, ''ও আমার ছোট দেওর।'' তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে বললেন, ''আর উনি আমার স্বামী।'' গ্রামের বধূটির মতো তাঁর এই বাচনভঙ্গিতে উৎফুল্ল গ্রাম্যরমণীরা আশীর্বাদ করল তাঁকে—''পার্বতীর মতন স্বামীর প্রিয় হও''—''পারবতী সম পতিপ্রিয় হোহূ।''[১২] কতটা অভিমানশূন্য হলে এমনভাবে সবার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়া যায়! 'যাকে যেমন, তাকে তেমন'-এর দৃষ্টান্তও যেন সীতা-প্রতিমা।

খালি পায়ে হাঁটেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—দেখে গ্রামবাসীদের বড় কষ্ট হয়। সীতা আবার সন্তর্পণে স্বামীর পদচিহ্নটি এড়িয়ে পা ফেলেন। ''প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা,/ ধরতি চরণ মগ চলতি সভীতা॥''[১৩] তুলসীদাস বলছেন, পারস্পরিক মর্যদা রক্ষা এবং অপরূপ প্রীতির এই চিত্র দেখে বনের পশুপাখিরাও যেন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। একবার তাঁরা যমুনা নদীতে স্নান করে যমুনাতীরে বিশ্রাম নিচ্ছেন, হঠাৎ সেখানে অত্যন্ত তেজস্বী এক বালক তপস্বী এসে উপস্থিত। তিনি রামভক্ত। রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে আলিঙ্গন করেন। আনন্দে বিহ্বল সেই তাপস জানকীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে সীতা তাঁকে শিশুসন্তানজ্ঞানে আশীর্বাদ করেন। কী-ই বা বয়স তখন সীতার, কেউ প্রণাম করে পদধূলি নিলে সংকোচ হওয়ার কথা, কিন্তু এই করুণাময়ী মাতৃমূর্তিতে তাঁকে বহুবার আমরা দেখতে পাই। অবতারসঙ্গিনীর ভূমিকাই তো সব শোকতাপ সহ্য করে মাতৃস্নেহে আশ্রিতকে কোল দেওয়া! সীতা বা সারদা—যুগে যুগান্তরে আমরা দেবীর একই ভূমিকার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ উদ্দেশ্যহীনভাবে বনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা কিন্তু নয়। তাঁরা বিভিন্ন তপোবনে, মুনি ঋষিদের আশ্রমে গেছেন, তাঁদের

সেবা-পরিচর্যা করেছেন, তাঁদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সাধুসঙ্গে ও শাস্ত্রচিন্তায় বনবাসের নির্জন দিনগুলিকে তাঁরা সর্বতোভাবে মূল্যবান করে রেখেছিলেন। ঋষিপত্নীদের সঙ্গে সীতা এমন ব্যবহার করতেন যেন তাঁরা কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা। অত্রিমুনির স্ত্রী অনসূয়া মহাতপস্বিনী। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি তপস্যাপ্রভাবে জাহ্নবীকে আশ্রমে প্রবাহিত করে বহু ঋষিমুনির প্রাণরক্ষা করেছিলেন। অতিবৃদ্ধা অনসূয়া যখন সব বিলাস-সম্পদ ত্যাগ করে স্বামীর কারণে সীতার এই কৃচ্ছ্রতাবরণের প্রশংসা করতে থাকেন, তখন নিরভিমানী, বিনম্র সীতা বলেন, ''মাতা, সম্পদে কি কাম।/ সকল সম্পদ মম দূর্বাদল শ্যাম॥''[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সীতামূর্তির দর্শন হয়েছিল। পরে তিনি বলেছেন, ''আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। ... হাত, পা বসন,-ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না।''[১৫] কতটা টান হলে ঈশ্বরলাভ হয় তাঁর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সীতার এই অনন্য রামভক্তির কথা অনেক বার বলেছেন। এ-প্রসঙ্গে কথামৃতকার বলেন, ''সীতা রামময়জীবিতা,—রামচিন্তা করে উন্মাদিনী—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!''[১৬]

সীতার সর্বস্ব শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র ছাড়া তাঁর আর কোনও পৃথক অস্তিত্বের বোধ ছিল না, কিন্তু তবু প্রয়োজনে রামকে তিনি নিজস্ব মত জানাতেন, পরামর্শ দিতেন। তিনি প্রেমে, কর্তব্যে সবক্ষেত্রে রামের অনুগামিনী—কিন্তু স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ একসময় চিত্রকূট ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে আসেন। সেখানে রাক্ষসদের বড় উপদ্রব। রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করে দিত। তপস্বীরা রামকে অনুরোধ জানান যে তিনি যেন তাঁদের রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সেই অরণ্যে যেসব বানপ্রস্থী, তপস্বী এবং সন্ন্যাসীরা বাস করতেন তাঁদের অনেকেই নিহত হয়েছেন। তাঁদের স্তূপাকার অস্থি জমে আছে বনের বিভিন্ন স্থানে। বনবাসীদের সুরক্ষা এতটাই বিপন্ন। রঘুবীর সকলকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি অবশ্যই রাক্ষস বিনাশ করবেন। তাঁদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। রামের এই আশ্বাসবাণী কিন্তু সীতার পছন্দ হয়নি। তিনি ক্ষত্রিয় রমণী। আমরা প্রথমেই দেখেছি যে সীতা রাজধর্মে অভিজ্ঞা। প্রজাকে সুরক্ষা দান যে ক্ষত্রিয় কর্তব্য তা কি তিনি জানেন না? তবু পথে যেতে যেতে রামচন্দ্রকে বলতে থাকেন, ''তুমি যে ঋষিদের কাছে রাক্ষসবধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, সেটা আমার একটুও ভাল লাগছে না। তোমার মঙ্গল চিন্তা করি বলেই ভয় পাচ্ছি। মিথ্যা বলা, কামজ ব্যসন আর হিংসা—এই তিনটি মানুষকে অধর্মের দিকে নিয়ে যায়। প্রথম দুটি তোমার কখনই নেই জানি। তাহলে তৃতীয়টাই বা থাকবে কেন রঘুবীর? তুমি পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে এসেছ তপস্যা করতে। এখন তো তোমার তপস্বীদের ধর্ম পালনীয়। তোমার শত্রুতা না করলে কেনই বা রাক্ষসবধ করতে যাবে আর্যপুত্র? তুমি তোমার ক্ষাত্রধর্ম বরং অযোধ্যায় গিয়ে পালন কোরো।'' রামচন্দ্র নানা যুক্তি দেন রাক্ষসনিধনের সপক্ষে, সীতা চুপ করে যান। নিজের মতকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই আসে বাদানুবাদের প্রশ্ন। সীতা কলহ করেননি কোনওদিন, বড় স্নিগ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু শুদ্ধ মনের আশঙ্কা তো মিথ্যা হয় না। যখন অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেকের দিনে 'পিতা ডাকছেন' শুনে রামচন্দ্র সীতাকে রেখে চলে যাচ্ছিলেন, তখন অনেক মঙ্গলাচরণ করেন সীতা, বহু দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন, হয়তো সেজন্যই দুর্যোগের আঘাত এলেও তা তাঁদের কাতর করেনি। বনবাসের দশটি বছর তাঁরা শান্তিতে, আনন্দেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর মঙ্গলবাক্য

বলার সুযোগই পেলেন না জনকনন্দিনী। দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করে তাঁরা পঞ্চবটীতে আসেন। অত্যন্ত দুর্গম এই বনপথ—এই ভয়াল কানন। সেই পঞ্চবটীতে, রামসীতার বনবাসযাপনের দশবছর পর, এই প্রথম রাক্ষসতাড়িত অন্ধকার অরণ্যের ছায়া এসে পড়ল রামসীতার জীবনে। সীতার অমঙ্গল আশঙ্কা অবশেষে সত্য হল। রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতায় নিপুণ লেখনীতে আঁকছেন সেই ছবি : ''আর-একদিন, ভেবে দেখো মনে,/ যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে/ ফিরিয়া নিভৃত কুটিরভবনে/ দেখিলা জানকী নাহি—/'জানকী' 'জানকী' আর্ত রোদনে/ ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,/ মহা-অরণ্য আঁধার-আননে/ রহিল নীরবে চাহি।''

সীতার অপার দুঃখগাথা আর সহনের তপস্যা আমাদের অশ্রুসজল করে, আদর্শের সামনে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে সম্ভ্রমে আনত করে। সীতাচরিত্রের শেষ দৃশ্য যেন নারীর আত্মমর্যাদার শেষ কথা। দীর্ঘকাল রামহীন বনবাসযাপনের পর সীতার সন্ধান পেয়ে রাজা রাম যখন সীতাকে আবার রাজসভার মাঝে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেন, সেদিন সেই অসম্মানের ক্ষণেও রামময়জীবিতা সীতা স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করলেন না, ''সেদিন ক্লিন্ন কৌষেয়-বসনা করুণাময়ী দুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে বলিলেন, 'হে মাতঃ বসুন্ধরে, যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।''[১৭] ''সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে/ বিদায়বিনয়ে নমি রঘুরাজে/ দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে/ হইলা অদর্শন।''

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ।...যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই সাধ্বী, সেই সদাবিশুদ্ধ-স্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা নরলোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা, মহনীয়-চরিত্রা।''[১৮]

রামায়ণ মহাকাব্যে দুঃখ, সহনশীলতা, ত্যাগ এবং সেবার পরিশুদ্ধ আমাদের মা জানকীর জীবনকথা। কত যুগ কেটে গেছে, কিন্তু সীতার আখ্যান পুরনো হয়নি—পবিত্রতার শক্তিতে আজও আমাদের সঞ্জীবিত করে চলেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা যেন আমাদেরই প্রাণের কথা—''তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত—তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান।''[১৯]

তথ্যসূত্র

১। মহর্ষি বাল্মীকি *রামায়ণম্*, অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, খণ্ড ১, নিউলাইট, কলকাতা, অযোধ্যাকাণ্ড, ১৬।১০ [এরপর, *রামায়ণম্*]
২। *রামায়ণী কথা*, দীনেশচন্দ্র সেন, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ ১৩৪
৩। রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬।৪
৪। কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃঃ ১২৫
৫। *রামায়ণম্*, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯। ১৭, ১৮
৬। *কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ*, পৃঃ ১২৬
৭। *রামায়ণম্*, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯।১৭
৮। তদেব, ৩৯।১৭
৯। *কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ*, পৃঃ ১৫১
১০। *রামায়ণম্*, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৩।৫,৮
১১। *শ্রীরামচরিতমানস* (তুলসীদাসী রামায়ণ), গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৮, পৃঃ ৫৮৮
১২। তদেব ১৩। তদেব, পৃঃ ৫৯৪
১৪। *কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ*, পৃঃ ১৫৬
১৫। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪২০, পৃঃ ৩৩৬ ১৬। তদেব, পৃঃ ৩৩১
১৭। *রামায়ণী কথা*, পৃঃ ১৩৪,
১৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *ভারতীয় নারী*, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৫,
১৯। *রামায়ণী কথা*, পৃঃ ১৩৪